বেড়াল
কবি চক্রবর্তী

বাড়ি থেকে বেরোতেই সরু পায়ে চলার পথ। মিনিট দু-তিনেক বাদে পৌর সভার পাকা রাস্তা। লাইন দিয়ে রিক্সা, সওয়ারির অপেক্ষায়। গলি থেকে কাউকে বেরোতে দেখলেই ওরা নড়ে চড়ে বসে। -ও দিদি, এদিকে আসেন।

সুমিতা রায়। পাড়া বা পরিচিত মহলে সুমিতাদি। বাড়ি থেকে বাসস্টান্ডের দূরত্ব অনেকটাই। কিন্তু সুমমিতাদি নেহাৎ ঠেকায় না পড়লে রিকসায় ওঠেনা। গলি থেকে রাজপথে এলেই যেন ছুটতে থাকে। যদিবা কখনো ওঠে, এক রিক্সায় নয়, পালা করে ওঠেন।

দৌড়াতে দৌড়াতে বাসস্ট্যান্ড এসে দেখে সময়ের বাস বেরিয়ে গেছে। পরের গাড়ি হয়তো আধঘন্টা বাদে। স্ট্যান্ড থেকে দশ কিলোমিটার। পনেরো মিনিটের পথ, ত্রিশ-পয়ত্রিশ মিনিটেও পৌঁছায় না। সুমিতা পলাশডাঙ্গায় যখন বাস থেকে নামে, তখন ঘড়ির বড় কাঁটাটি এগারোটার ঘর পেরিয়েছে।

স্ট্যান্ডে নেমেই দৌড়। হাটখোলার ছোট ছোট চালা ঘর গুলির মাঝ বরাবর রাস্তা। শেষ পারঘাটে। বর্ষায় নৌকা, খরায় মাচা। বর্ষায় নৌকা থেকে নেমেই থকথকে কাদা। খরায় বালুচর। ঠা-ঠা রোদ। নদী পেরোলে চাঁপাগঞ্জ। এক কিলোমিটার হেঁটে দুর্গাপুর নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়।

প্রায়শই ঘেমে নেয়ে স্কুলে পৌঁছাতে বেলা বারোটা কিংবা আরো বেশি। হাজিরা খাতায় সইকরা নিয়ে নৈমিত্তিক ঝামেলা। বিরূপ মন্তব্য। সুমিতার একটাই কথা –সব সামলে এর আগে আমি আসতে পারব না।

বিয়ের পর অল্প কটা দিন। কন্যা শর্মিলা সবে হাঁটি হাঁটি। সুখ পাখিটা রোজ সকালে রোদ স্নান সেরে জানালায় বসে গান গায়। কিন্তু হঠাৎই একদিন সামান্য জ্বর অসামান্য হয়ে সুমিতা ও শর্মিলার জীবন থেকে হারিয়ে গেল সুখ পাখিটা।

এবার ভাই –এর সংসার। দু-চার মাস যেতে না যেতে দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি। এক বন্ধুর পরামর্শে মালদলহ জেলার পিপলা মাদার ট্রিনিং সেন্টার থেকে ট্রেনিং। ফিরে মাদার টিচার হিসাবে কাজে যোগদান। খানিক হলেও পায়ের তলায় শক্ত মাটি। মুস্কিল, মাদার টিচার বেসিক স্কুল ছাড়া পোস্ট নেই। কাছাকাছি বলতে দুর্গাপুর বেসিক স্কুল। সেই থেকে এখানে।

স্বামি মারা যাবার পর অবলম্বন বলতে একমাত্র সন্তান, ঠাকুর দেবতা। এখন চাকরি। সকল হতেই দম ফেলার অবকাশ নেই। সকালের শুরুতে রান্না-বান্না। মেয়ের স্কুলের প্রস্তুতি। সব মিটলে চান সেরে ঠাকুর ঘর। তাদের খিদমৎ করতে স্কুলের বেলা দৌড়ায়। কোনো কোনো দিন খাওয়াও হয় না। এরপরেও নৈমিত্তিক

ঘটনার ঠোকাঠুকি। বিরক্ত প্রধান শিক্ষক-একদিন বলেন-সুমিতাদি, এভাবে চলতে পারে না। আপনি বরং কাছাকাছি কোথাও থাকার ব্যবস্থা করেন।

সুমিতাদি চোখের কোণে জল নিয়ে বললে – মাস্টার মশাই, আমার অবস্থার কথা জেনেও বলছেন।

-কী করবো। নিত্য দিন অশান্তি ভালো লাগেনে?

-যারা আাগে আসে আর দু-টোতে চলে যায়? আমি যেমন পরে আসি, তেমন পরে যাই।

-আপনার জন্য ওরাও এমন করে।

-ঠিক আছে। আমিও দেখব। নিয়ম যেন এক হয়।

খোঁজ খুঁজির পর সত্যি সত্যি দুর্গাপুরের গা লাগোয়া গ্রাম চকগোবিন্দয় এক গৃহস্থ বাড়িতে স্থান পায় সুমিতাদি। ঐ বাড়ির এক মেয়ের নাম সুমিতা।। দিন কয়েকের মধ্যে সুনিতাদি ধর্ম মেয়ে হয়ে বসবাস শুরু করে। শর্মিলা পড়াশোনার জন্য শহরেই থেকে যায়। দু-একদিনের ছুটি-ছাটায় মার কাছে আসে। মেয়ে না থাকলে গোপাল থাকে। সে জন্য গোপালের সেবা দিতেই অনেকটা সময় যায়। বাসস্থান থেকে স্কুলের দুরত্ব মাত্র মিনিট দশেক। তবু দেরি হয়ে যায়। আবার দড়ি টানাটানি। প্রধান শিক্ষক কমল দাস পড়েন মহা ফাঁপড়ে। এতো বড্ড ঝকমারি হল। সবাই নিজের কোলে ঝোল টানে। তিনি বেশ বুঝতে পারেন সুমিতার দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে সকলে। শিক্ষক মন্ডলীতে সেংখ্যায় ওরা বেশি। কিছু করতে পারেন না। এভাবেই দিন চলে। গ্রীষ্ম, বর্ষা শরৎ, হেমন্ত ছয় ঋতুর নানা বৈচিত্রময় দিন। রঙ, রূপ, রস ভরা দিন। দিন গুলি কত আনন্দ, সুখ, দুঃখ নিয়ে আসে-যায়। পরিবেশের এই ঘূর্ণবর্তে কোনো পরিবর্তন নেই-সে ঐ দুর্গাপুর নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে। সেখান ছয় ঋতু, বারো মাস এক চিত্র। স্কুলের শুরুতে, টিফিনের ঘন্টায় একটু সুযোগ পেলেই লড়াই শুরু। তখন আশ-পাশে কাক-চিল বসতেও ভয় পায়।

সুমিতাদির কন্ঠস্বর অবশ্য সকলের ওপর দিয়ে চলে। তারপর কান্নাকাটি। অবস্থা চরমে উঠলে কমল বাবুকে মাঝে দাঁড়াতেই হয়। শান্তি, ছুটি ছাটায়। বর্ষা কিংবা পুজোর ছুটি গুলো এলে স্কুল বাড়িটাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

ছুটিতে সমিতা ফেরে শহরে। মা ও মেয়েতে কয়েকটাদিন ভালো ভাবে থাকা। কিন্তু, বিধিলিপি যে অন্যকথা বলে। মায়ের রোজকার স্নেহ-মমতার বাইরে থেকে সেখানেও কখন একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে।

সুমিতা বোঝে, মেয়েটা যেন কাছে থেকেও কাছে নেই। বরং জেদি, কেমন বে-পরোয়া ভাব। যা বলে, যা চায় সঙ্গে সঙ্গে তা না পেলে অনর্থ ঘটে। কখনও স্বামীর ছবির সামনে, কখনও গোপালের পথ বাতলায় না। ঘুণপোকার মতো সমস্যাগুলি কুড়ে কুড়ে খায়। তবু সিংহাসনে রাখা স্বামীর ছবি, গুরুদেবের ছবি আর

গোপাল ভরসা। দিনের বেশির ভাগ সময় ওঁদের নিয়েই কাটে। খানিক হলেও স্বস্তি মেলে।

সব মিটিয়ে যখন খেতে বসে, ক্ষয়িষ্ণু দিনের শরীরে লাগে সিঁদুরের রং। ছুটি হয়ে মেয়ে ফেরে। স্কুল ব্যাগ ছুঁড়ে দিয়ে চিৎকার করে- মা, খেতে দাও। খুব খিদে পেয়েছে।

সুমিতা খেতে বসে কথা বলে না। মেয়ের তাগাদায় তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে। তাড়াতাড়ি খেতে গিয়ে জোর বিষম খায়। শেষে থালায় জল ঢেলে উঠে পড়ে। ঘর থেকে বেরিয়ে বলে –একটা সবুর সয় না। তুই তো জানিস আমি এক বেলা খাই।

মেয়ে শর্মিলা মায়ের কন্ঠস্বরের ওপরে একমাত্র বাড়িয়ে ঝামটা দেয় – এখনতো স্কুল নেই! কী করে এতক্ষণ?

-তোরই বা এতো তাড়া কিসের?

- আমি ইভিনিং শো সিনেমা যাবো।

-মানে?

- মানে আবার কী। শুনতে পাচ্ছো না সিনেমা-!

সুমিতা জোর দিয়ে বলে – তোর পড়াশোনা নাই

শর্মিলা ধৈর্য হারায় – আমি যাবো ব্যাস।

বাক্য ব্যয় না করে সুমিতা মেয়েকে খেতে দিয়েই সরে যায়। বুকের ভেতর মোচড়ানো ব্যাথা। চোখে জল। শর্মিলা কোনো তোয়াক্কা না করো জুতোয় খট খট আওয়াজ তুলে বেরিয়ে যায়।

ছুটি শেষ। আসনের ঠাকুরদের পোটলা বেঁধে চক্‌গোবিন্দ গ্রামে ফিরে আসে। আবার সেই বাঁধা গৎ। সুমিতা খেই হারায়। রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে না। মেয়ের জন্য মন কাঁদে। কিন্তু মায়ের জন্য মেয়ের হোলদোল নেই। কত রাত সুমিতার চোখের ওপর দিয়ে চলে যায়।

বর্ষার ছুটির মাস খানেক বাদে পুজো। পুজোর ছুটেত আবার ঘরে ফেরা। কেনা কাটা হয়নি। ষষ্ঠির সকালে মেয়ে সাথে বাজারে। দেখতে দেখতে মেয়ের বয়েস চোদ্দ-পনেরো । সে তুলনায় পড়াশোনা এগোয়নি। দোকানে গিয়ে অল্পতে মন ওঠে না। শুধু সালোয়ার কামিজে হবে না। শাড়ি চাই। জুতো চাই। সুমিতাকে একে একে সব আবদারই মেটাতে হয়।

অষ্টমীর সন্ধায়। পাড়ার পুজোতে সন্ধি পুজোর সময় সুমিতা ব্যস্ত। মেয়েও আজ শাড়ি পড়েছে। বন্ধুদের দল নিয়ে ঠাকুর দেখতে। সুমিতা বলেছে তাড়াতাড়ি ফিরিস। মেয়েরও তৎপর জবাব – হ্যাঁরে বাবা হ্যাঁ।

সে রাতে মেয়ে অবশ্য ফেরেনি। সুমিতাদি পুজো মন্ডপ থেকে ফিরে অনেক রাত অবধি বসে থেকেছে। একসময় উপবাসের ক্লান্তি জড়িয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

আবার অনেক গুলো খরা – বর্ষা – চলে গেছে। সুমিতাদি স্কুলে আসা-যাওয়া করে শহর থেকে। চক গোবিন্দ গ্রামে ফেরেনি। সপ্তাহে এক আধদিন ধর্ম মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে। মনের কষ্ট গুলোকে-হালকা করে। ছুটি ছাটার দিনে সময় গুলো ঠাকুর ঘরে। কোনো দিন খায়, কোন দিন না খেয়ে চলে যায়। একার জন্য কিছু করতে মন চায় না।

এর মধ্যে মেয়ে বার কয়েক এসেছে। এন্ট্রি পায়নি। ফিরে গেছে বারবার। তিনটি সন্তানের জননী। জামাই ছেলেটি ভালো চাকরি করত। কী এক অজ্ঞাত কারণে চাকরি ছেড়ে সাধু সেজে ঘরে। মাঝে মধ্যে মারা-ধরাও করে। শর্মিলাকে তাই মা-র কাছে আসতেই হয়। বাচ্চা গুলো সঙ্গে আসে।

সুমিতাদি আর ফেরাতে পারে না। শেষ পর্যন্ত জামাই-মেয়ের হাতে ঘর বাড়ি ছেড়ে দুর্গাপুরেই এক বাড়িতে পেয়িংগেস্ট হয়ে থাকে। মাস মাহিনাটুকু হাতে এলেই মেয়ে এসে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। যৎসামান্য সম্বল নিয়ে মাস চলে। ইদানিং নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলে। স্বামীর ছবির সাথে কথা বলে। বাকি সময় গোপাল। এসব করতে করতে স্কুলের সময় টান পড়ে। স্কুল লাগোয়া থাকলেও শেষমেষ ঐ বারোটা।

অতএব প্রাত্যহিক লড়াই জারি থাকেই। একদিন এস. আই চলে আসার ফলে ঝামেলা বাধল। সুমিতাদি প্রথম বুঝতে পারেনি। যাবার সময় পরিদর্শক মশাই সাবধান করে দিয়ে গেলেন। বলে গেলেন এমন হলে একদিন বেতন কাটা হবে।

সুমিতাদি নানা অনুনয় বিনয় করতে থাকলেও পরিদর্শক কোনো অজুহাতই শুনতে চাইলেন না। ভদ্রলোক চলে যেতেই বাঘিনীর মতো কমল বাবুর ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। -শোনেন মাস্টার মশাই, আপনাদের বেলায় দোষ নাই। যতো দোষ আমার। আপনারাই সাহেবকে লাগিয়েছেন আমার নামে। সুমিতাদি কেঁদে ফেলেন।

একটা সময় আসে দেয়ালে পিঠ লেগে গেলে বিড়ালও নাকি বাঘের মতো আচারণ করে। সুমিতাদির চলা-ফেলার এমনই ভাব। ডোন্ট কেয়ার। সবাই ভাবে ব্যাপার কী? যখন খুশি আসে। যখন খুশি যায়। কমল বাবু বোঝান-দিদি, এস.আই কিন্তু আবার আসতে পারেন।

-আমি আর ভয় পাইনা কমল বাবু। আপনি বরং এস.আই কে খবর দিন।

কমল বাবু কথা বাড়াতে সাহস পান না। কষ্টও হয়। মহিলার ওপর দিয়ে কম ঝড় ঝাপটা তো যায়নি।

যত দিন যায় সুমিতাদির মধ্যে নানা অসঙ্গতি দেখা দেয়। কথা বলতে ধরলে অনর্গল বলে। চুপ থাকলে একেবারে চুপ। সহকর্মীরা, কমলবাবু খুব একটা ঘাটান না।

মাঝে সম্ভবত মাস তিনেকের ফারাক। এস.আই সাহেব পাশের স্কুলে যাবার সময় দুর্গাপুর নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে একবার ঢু মারলেন। যথারীতি সুমিতাদি তার নিয়মে স্কুলে আসতেই এস.আই গরম সুরে বলেন-কী ব্যাপার দিদিমনি?

সুমিতাদির নির্বিকার জবাব-কী স্যার?

-হাজিরা নিয়ে গতবারে আপনাকে সাবধান করেছিলাম।

-করেছিলেন

-তবে?

সুমিতাদি কথা বাড়ান না। কাঁধের ঝোলাটা নিয়ে এস.আই-এর সামনে রেখে বলেন, এদের জন্যই আমার দেরি। ঝোলা থেকে বেড়াল নয়, গোপাল সহ নানা দেব-দেবীর মূর্তি সাহেবের সামনে একে একে রাখতে থাকে।

এই মুহূর্তে সাহেবের মুখে কোন কথা নেই।